যুগান্তর
তারিখ 04 SEP 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

অভুক্ত শিক্ষকরা ছাত্র পড়াবেন কিভাবে

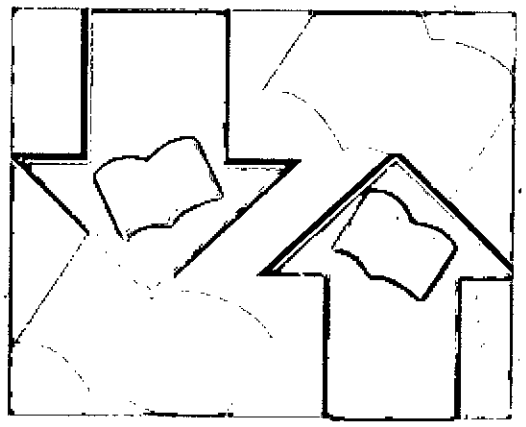

একাত্তরের পরের প্রজন্ম সঙ্গত কারণেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সম্যক অবহিত নয়। হওয়ার কথাও নয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর একাংশের ইচ্ছাকৃত অবহেলা, অন্যদের দায়সারা মনোভাব, ক্ষেত্রবিশেষে অতি আত্মতুষ্টি সেজন্য প্রধানত দায়ী। আবার একটি মহলের 'আমাদের পেছনে না তাকিয়ে সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে' এই সুচতুর বক্তব্যও কম দায়ী নয়। এরপর যাদের বয়স পঁচাশের কোঠায় তারা জানেন এবং অনেকে সাক্ষীও বটে, কিভাবে একাত্তরে স্বাধীনতার বিজয় ছিনিয়ে আনার ঠিক দু'দিন আগে জন্মলগ্নেই বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করতে ১৪ ডিসেম্বর আমাদের চেতনা ও বিবেকের প্রতীক অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ডা. আবদুল আলিমের মতো কৃতী মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। হত্যাকারীদের কেন বিচার হয়নি তা গবেষণার বিষয় নয়, দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। সেই সঙ্গে জাতীয় লজ্জারও নির্ভুল চিত্র। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ছিল হাতেগোনা বিত্তবানদের বৈষম্য-বঞ্চনার কবল থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের পরিত্রাণের পথ রচনা। আটচল্লিশ, রায়ান, বাষট্টি, ছেষট্টি, উনসত্তর, সত্তরের পথপরিক্রমায় রচিত হয়েছে একাত্তরের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ধারা। কিন্তু এ কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না যে, বাংলাদেশের প্রধানতম সম্পদ যে জনগণ তার জীবনধারা ও জীবনের মান উন্নয়নের বিরুদ্ধে একটি গোষ্ঠী শুরু থেকেই পরিকল্পিত ও ধারাবাহিকভাবে কাজ করে আসছে। এরা সরকারের নীতিপ্রণেতা ও বাস্তবায়নকারী দুটিই। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সন্তানরা যেখানে লেখাপড়া করে, সেখানে তাদের হাত দিয়ে অর্থ ও সম্পদ বরাদ্দ হয় কম। আর স্বল্পসংখ্যক বিত্তবানের সন্তানদের প্রতিষ্ঠানে অর্থ ও সম্পদের সিংহভাগ অকৃপণভাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার উজাড় করে ঢেলে দেয়া হয়। এদের কর্মকাণ্ডে মনে হয় বাংলাদেশ উচ্চবিত্তের জন্যই স্বাধীন হয়েছে। দেশের নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ', সে দেশ প্রজা অর্থাৎ সাধারণ মানুষের শাসন করার কথা। তাদের স্বার্থই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা। দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা এই, সেখানে সাধারণ মানুষের; স্বল্প আয়ের মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্য দুটিই সব সরকারের নিষ্ঠুর অবহেলা ও অনীহার শিকার। যে কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল তা থেকে মানুষকে ভুলিয়ে রাখার নানা কলাকৌশল, রাজনৈতিক ভাংচুর করে পঁচাত্তরের পরের শাসকরা স্থাপন করেছে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মুনাফার লোভে একের পর এক বেসরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। তারপরও সমসুযোগ-সুবিধা দিয়ে সব অবস্থান থেকে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিযোগিতার আয়োজন না করে একতরফা পক্ষপাতমূলক সমর্থন জোগানো হয়েছে মুনাফা শিকারি তথাকথিত 'বেসরকারি প্রতিষ্ঠান' বা উদ্যোগকে। যা আধুনিক বিচারে বেসরকারিও নয়— সামন্তবাদী ও প্রাক-সামন্তবাদী সময়ের অনুরূপ নির্লজ্জ শোষণের ব্যবস্থা মাত্র!

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত প্রাথমিক শিক্ষায় এক ডজনের বেশি ধারা-উপধারা সৃষ্টি করে নিত্যনতুন বৈষম্য ও অব্যবস্থাপনার পথ উন্মুক্ত করা হয়েছে। সুকৌশলে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অস্বীকার করে স্বীকৃত জাতীয় অবস্থান থেকে বাংলাদেশকে দূরে ঠেলে দেয়ার অপচেষ্টা নতুন করে শুরু হয়েছে। প্রাথমিকের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমিক স্তরে। ল্যাবরেটরি বলতে যা বোঝায় তার ধারেকাছেও নেই সেসব প্রতিষ্ঠান, যেখানে বিজ্ঞান শাখা আছে। এ ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি কোনটারই হাল ভালো নেই। তবে শিক্ষার আটানব্বই ভাগ দায়িত্ব পালনের বোঝা যাদের মাথায়, সে বেসরকারি স্কুলের অবস্থা সবচেয়ে বেশি শোচনীয়। সেখানে লাইব্রেরি-লাইব্রেরিয়ান কোনটাই নেই। সরকারের কর্তাব্যক্তিদের এসব দিকে দৃষ্টি নেই। লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরি উন্নয়নে সময় ও সম্পদ বিনিয়োগ না করে তার পরিবর্তে দালানকোঠার উন্নয়নে তারা বেশি ব্যস্ত। নিজেদের বিদেশ যাত্রা নিশ্চিত করতে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা সংবলিত বিদেশী অর্থায়িত প্রকল্প তাড়াহুড়ো করে, উপযোগিতা মূল্যায়ন ও জনমত যাচাই না করে গ্রহণের প্রবণতার কোন পরিবর্তন সেখানে নেই।

শুরুতেই উল্লেখ করেছি, কিভাবে ধারাবাহিক পরিকল্পিত চক্রান্তের কলাকৌশল বিস্তার করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের প্রাক্কালে জাতিকে মেধাশূন্য করার অপচেষ্টা চালানো হয়। আজ ভিন্ন কৌশলে তা করা হচ্ছে। যেমন স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত বিরোধিতাকারীরা নিজেরাই 'মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ গঠন' করেছে। বিশ্বায়নের কথা বলে মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে অবাধ লুণ্ঠনকে প্রশ্রয় দেয়ার প্রতিযোগিতা চলছে বর্তমানে ক্ষমতার বাইরে অবস্থানরত, আবার ক্ষমতায় আসীন হতে মরিয়া চেনা মুখদের মধ্যে। শিক্ষা ক্ষেত্র বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় (মুনাফাভিত্তিক ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান নয়) মেধাবীরা যাতে শিক্ষকতায় আসতে না পারে, এসেও টিকে থাকতে না পারে, সেজন্য অবাস্তব বিধি-নিষেধ চাপানো ও কড়াকড়ি আরোপ করা হচ্ছে। ন্যায্য বেতন-ভাতা, সামাজিক মর্যাদা তো আগে থেকেই নেই। এখন এর সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে এমন শর্তের বেড়াজাল যাতে করে নিরুপায় মানুষ ছাড়া কেউ আর এ পেশায় থাকতে আগ্রহী হচ্ছে না। মেধাবীরা যদিওবা দু'একজন কোনভাবে শিক্ষকতা পেশায় এসে যায় তারাও বড়জোর বছর তিনেকের মধ্যে উন্নততর সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে পেশা ছেড়ে চলে যায়। এদিকে সর্বশেষ বাজেট ঘোষণায় সরকারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে কিছু না বলে শুধু বেসরকারি শিক্ষকদের এমপিও বা বেতন-ভাতার সরকারি অংশ প্রাপ্তির শর্ত হিসেবে 'সাফল্য'কে যুক্ত করা হয়েছে। স্পষ্ট করে না বললেও ছাত্রছাত্রীর পাবলিক পরীক্ষায় সাফল্যই বোঝানো হয়েছে। আমাদের দেশে শুধু পাবলিক পরীক্ষানির্ভর পন্থা-পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন নিয়েই নানা প্রশ্ন আছে। আমাদের জানা মতে, পৃথিবীর কোন দেশে পরীক্ষায় ছাত্রের খারাপ রেজাল্টের জন্য এককভাবে শিক্ষককে দায়ী করে তার বেতন বন্ধ হয় না। পরিবার-পরিজনসহ অভুক্ত রেখে বিনা বেতনে দায়িত্ব পালন করানোর এ ধরনের বাধ্যবাধকতার নজিরও কোন সভ্য দেশে নেই। পড়াতে না পারলে চাকরি থাকবে না— একথারও একটা যুক্তি আছে, কিন্তু না খেয়ে চাকরি করতে হবে এ ধরনের দৃষ্টান্ত কোথাও নেই। আবার যে শিক্ষক শিক্ষানবিশকাল অথবা প্রবেশন সীমা অতিক্রম করে চাকরিতে স্থায়ী হয়ে ২০-২৫ বছর ধরে কর্মরত, তাকে এখন কোন যুক্তিতেই অযোগ্য বলা যায় না। তারপরও মারাত্মক অসদাচরণের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে, অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে যথোপযুক্ত গ্রহণযোগ্য তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগ প্রমাণের পর চাকরিচ্যুত করার বিধান আছে। কিন্তু চাকরি থাকলেও বেতন পাওয়া যাবে না, না খেয়ে কাজ করতে হবে— এ ধরনের সিদ্ধান্ত মানবাধিকারের সরাসরি লংঘন।

অন্যদিকে ছাত্ররা কি কারণে ফেল করে, কোন বিষয়ে ফেল করে, কার জন্য ফেল করে, তা নির্ধারণ না করে ইংরেজি ফেলের জন্য ভূগোলের শিক্ষক, শিক্ষকের ভুলের জন্য অশিক্ষক কর্মচারীর বেতন বন্ধের মতো অবৈধ, অমানবিক, অবিবেচনাপ্রসূত সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারাদেশে শিক্ষকদের মধ্যে ইতিমধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এর পরিণাম কি? অনিবার্য পরিণাম, যে দু'একজন মেধাবী কোনভাবে শিক্ষকতায় এখনও টিকে আছেন, দ্রুতবেগে তাদের শিক্ষকতা পেশা ত্যাগ। এমনিতেই অন্য পেশার তুলনায় শিক্ষকতায় বেতন-ভাতা, মান-মর্যাদা উল্লেখ করার মতো নয়। বেসরকারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ অবস্থা সবচেয়ে করুণ। বাড়ি ভাড়া ১০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ১৫০ টাকা, সরকারি শিক্ষকদের বেতন বাড়লে স্বাভাবিক ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের ভাগ্যে তা জোটে না। কিছুটা পাওয়া যায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, পুলিশের লাঠিপেটা খেয়ে দিনের পর দিন রাস্তায় মার্চপাস্ট করে। ফলে যা হওয়ার তাই হতে যাচ্ছে। যারা চান যে ভিক্ষুক শ্রেণীর মানুষ এ পেশায় থাকুক, না পারলে চলে যাক— গরিব মানুষের, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের ছেলেমেয়েদের ভালো লেখাপড়ার দরকারইবা কি? তারা অবশ্যই এসব কার্যক্রমে কয়েকগুণ বর্ধিত উৎসাহ পাবে।

এক সময় জমিদারদের বাড়ির সামনে দিয়ে প্রজাদের পায়ে জুতা পরে বা মাথায় ছাতা দিয়ে যাওয়া বারণ ছিল। সেই সঙ্গে এ দেশের একশ্রেণীর জমিদার স্কুল স্থাপনের বিরোধিতা করত এই বলে যে, লেখাপড়া শিখলে প্রজাদের চোখ খুলে যাবে। তাদের যতদিন না জানতে দেয়া যায়, না বুঝতে দেয়া হয় ততই ভালো। আমাদের নীতি প্রণেতা ও বাস্তবায়নকারীরাও বুঝে গেছেন, সাধারণ মানুষ সচেতন হলে রক্ষা নেই। অজ্ঞানতা থেকে, মেধাশূন্যতা থেকে মুক্তির জন্য, ন্যায্য স্বার্থের জন্য বঞ্চিত মানুষ যা কিছু সম্ভব তার সবকিছুই করবে। বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ এ মুক্তি সংগ্রামেরই মহড়া চলছে।

principalqfahmed@yahoo.com
অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ : *জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী*